প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

প্রি-সাবমিশন সেমিনারের জন্য প্রদত্ত ৫০০০ (আনুমানিক) শব্দের সারসংক্ষেপ

গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-প্রেক্ষিতে সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

গবেষক

শুভদীপ সরকার

ইউনিভার্সিটি রিসার্চ ফেলো

এনরোলমেন্ট নম্বর-ARTS/DOC/13-14/53

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

৮৬/১, কলেজ স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০৭৩

ই-মেল- subhadips462@gmail.com

চলভাষ- +91 8820437659

তত্ত্বাবধায়ক

ডক্টর খোকন কুমার বাগ

সহকারী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

৮৬/১, কলেজ স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০৭৩

ই-মেল- khokan.beng@presiuniv.ac.in

চলভাষ- +91 9434672406

PRESIDENCY UNIVERSITY
KOLKATA

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা -৭০০০৭৩

গবেষণা-অভিসন্দর্ভের অধ্যায়সূচি

প্রথম অধ্যায়

সমালোচনা-সাহিত্য ও রবীন্দ্রমানসলোক

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন সাহিত্য : সমালোচক রবীন্দ্রনাথের নবনির্মাণ

তৃতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য : সমালোচক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে

চতুর্থ অধ্যায়

লোকসাহিত্য : রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে পুনরাবিষ্কার

পঞ্চম অধ্যায়

সমকালীন প্রাচ্য সাহিত্য ও সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

(ক. কবিতা, খ. কথাসাহিত্য, গ. প্রবন্ধ, ঘ. অন্যান্য)

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

সপ্তম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথকৃত সমালোচনায় পূর্ববর্তী ও সমকালীন চিন্তাবিদদের প্রভাব

উপসংহার

উল্লেখপঞ্জি

পরিশিষ্ট

ক। (রবীন্দ্রনাথকৃত সমালোচনার কালানুক্রমিক তালিকা)

খ। গ্রন্থপঞ্জি

গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৫০০০ (আনুমানিক) শব্দের সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা

স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বহু কাজ আমাদের পাঠ-পরিধির মধ্যে থাকলেও সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সামগ্রিকভাবে কাজের দৃষ্টান্ত সেই তুলনায় কিছুটা কম। বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর কিছু সমালোচনা পাঠকালে এই বিষয়ে আগ্রহ জাগার দরুন বিস্তারিত ভাবে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার নানা দিক নিয়ে আমি উৎসাহী হয়ে উঠি। নিবিড়-পাঠে দেখতে পাই কীভাবে সাহিত্য-সমালোচনা তাঁর হাতে হয়ে উঠেছে এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। আত্মবিরোধের জায়গা সেখানে থাকলেও নিজের সাহিত্য-জীবনের বিশ্বাসের ভূমি থেকে না সরে সেখানে তিনি নির্মাণ করেছেন সাহিত্য-সমালোচনার নতুন ঘরানা। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে বাংলা সাহিত্য পেয়েছিল সর্বপ্রথম সার্থক সমালোচনা সাহিত্যের আস্বাদ। পূর্বসূরির সেই দেখানো পথেই রবীন্দ্রনাথের যাত্রা।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের নানা দিকের মতোই সমালোচক রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কাজ করার প্রয়াস এর আগে হয়েছে। ডক্টর আদিত্য ওহদেদার-এর ‘সমালোচক রবীন্দ্রনাথ’ (১৩৬৮), সত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের ‘সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ’ (২০০৩) বইয়ের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে সেখানে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সমালোচনা কর্মের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা অপেক্ষা ঐতিহাসিকভাবে বাংলা সমালোচনা ধারায় সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে দেখার প্রয়াস বেশি মাত্রায় লক্ষিত। সেই জায়গা থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ ও তাঁর সমালোচক সত্তার নানা স্তরের গভীরে যাবার উদ্দেশ্যে আমাদের এই গবেষণা কর্মের প্রয়াস।

প্রথম অধ্যায়

সমালোচনা-সাহিত্য ও রবীন্দ্রমানসলোক

সাহিত্য সমালোচনা এবং তার সাহিত্য পদবাচ্যতার বিষয়টি আপাতভাবে দুটি পৃথক বিষয় হিসেবে মনে হলেও আসলে দুটি প্রশ্নই একই আধারজাত। এই দুটি প্রশ্নের মধ্যেকার যে ফাঁকটুকু আমরা অনুভব করতে পারি তা আসলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মূল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। তা হল, 'সৃষ্টিকর্ম' বলতে আমরা কী বুঝি? এর একটা অর্থ যদি হয় নতুন কিছুর সামনে পাঠককে মুখোমুখি করে দেওয়া তাহলে তাহলে যথার্থ সমালোচনাও নিশ্চিতভাবেই সাহিত্য। আর এই কারণেই কেবল সমালোচনার ক্ষেত্রটি সম্ভবত আর মূল রচনাটিকে বুঝতে সাহায্য করার মধ্যেই সীমায়িত থাকে না। তাকে ছাড়িয়ে তার ব্যাপ্তি গিয়ে পৌঁছায় 'Creation'-এর বিস্ময়কর বিচরণ ভূমিতে। তাই 'সাহিত্য সমালোচনা' অচিরেই 'সমালোচনা সাহিত্য'-এর অভিধা পায়।

তবে প্রকৃত সমালোচনা নিজেই যে সাহিত্য সমতুল একটি মৌলিক সৃষ্টিকর্ম তা পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের কাছে যতটা না অভিনিবেশের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে তার থেকেও বেশি সমালোচনাকে কিছু বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আধারে দেখার প্রবণতা বেশি পরিমাণে লক্ষ করা যায়। আর এই প্রবণতার জায়গা থেকেই জন্মগ্রহণ করেছে সমালোচনা সাহিত্যের অনেকগুলি নতুন নতুন তাত্ত্বিক আঙ্গিক। সমালোচনা সাহিত্যের বিষয়টিকে সম্যকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক যে কূট প্রশ্নের সমাধান করতে হয় তা হল সাহিত্য কী? আর সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় গ্রিসের প্রখ্যাত তাত্ত্বিক দুই গুরু শিষ্যের দিকে- প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল। তখন সাহিত্য আর কাব্য সমার্থক। তাই কাব্যের আলোচনা মানেই

সাহিত্যের আলোচনা হিসেবে আমাদের ধরে নিতে হয়। প্লেটো তাঁর বিখ্যাত 'রিপাবলিক' বইটিতে কবির বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো তুলেছিলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স'-এ তাই খণ্ডন করে অনুকরণ তত্ত্বের ভিন্নতর ব্যাখ্যা আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন। অন্যভাবে বললে বলা যেতে পারে কবিতা কী তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেই কবিতার সমালোচনা কীভাবে হওয়া উচিত তার একটি প্রাথমিক আদল তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। সাহিত্য সমালোচনার প্রাথমিক ভিত্তি প্রস্তরটি এখানে সূচিত হয়ে গেল। অন্যদিকে আরিস্টস্টল-পরবর্তী সাহিত্য চিন্তক ও কবি হোরেসের গুরুত্বপূর্ণ অথচ কৃশকায় কাব্যগ্রন্থ 'আর্স পোয়েটিকা' (Arc Poetica) বা 'দ্য আর্ট অফ পোয়েট্রি'-র শুরুতে রয়েছে এক শিল্পীর কথা আর তার শেষে রয়েছে এক কবির কথা। একজন কবির জায়গা থেকে তিনি কবিতার আঙ্গিক, ভাষা এবং শৈলী বিষয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনা করেছেন তা আসলে লনজাইনাসের (Longinus) সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে। হোরেসের সাহিত্যতাত্ত্বিক প্রস্থানের মূল শব্দ যদি হয় সমীচীনতা, তাহলে লনজাইনাসের সাহিত্যভাবনার ধ্রুবপদ হল ঊর্ধ্বায়ন। এখানে 'ঊর্ধ্বায়ন' শব্দটি সেই 'Sublimity' কে নির্দেশিত করছে যাকে প্রতিভার চূড়ান্ত শীর্ষবিন্দু হিসেবে ধরা যেতে পারে।

উপরে যাদেরকে নিয়ে আলোচনা করা গেল তাদের সময়কাল মোটামুটিভাবে পঞ্চম শতকের মধ্যে। এরপর আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সেই ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যতক্ষণ না রানি এলিজাবেথের ইংলন্ডে নবজাগরণের ঢেউ এসে পড়ছে। এই সময় থেকেই মূলত কাব্য, নাটকের পাশাপাশি সমালোচনামূলক নানা রচনারও আবির্ভাব হয়। মূলত এই সময়েই প্লেটো, আরিস্টটল, হোরেসের সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্বের বইগুলি অনূদিত হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে আমাদের ফিলিপ সিডনির (Philip sidney) (১৫৫৪-১৫৮৬) 'The Defence of Poetry'-এর কথা মনে পড়ে যাবে। এটির রচনাকাল ১৫৮০ সালে হলেও প্রকাশিত হয়েছিল ১৫৯৫

সালে স্টিফেন গসনের ‘The school of abuse’ নামক সন্দর্ভের প্রতিক্রিয়া রূপে। ইংরেজিতে যাকে বলা যায় ক্লাসিসিজম বাংলায় তাকেই বলা হয় ধ্রুপদীবাদ। প্লেটো থেকে শুরু করে ফিলিপ সিডনি পর্যন্ত সাহিত্য সমালোচনার যে দীর্ঘ যাত্রাপথ তাকে আমরা মূলত এই ধ্রুপদী ঘরানার মধ্যেই ফেলি। এরপর ইংলন্ডে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগে কবি-নাট্যকার এবং অবশ্যই সাহিত্য সমালোচক জন ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্যের জনক। এবং এখান থেকেই আসলে আমরা ক্লাসিসিজমের সীমানা পেরিয়ে আমরা প্রবেশ করব নিও-ক্লাসিসিজমের পরিসরে। মনে পড়ে যাবে ড্রাইডেনের ১৬৬৮-তে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ- ‘Essay of Dramatic Poesy’। নিও ক্লাসিসিজমের একেবারে শেষ পর্যায়ে যাদের নাম আমাদের স্মরণ করতেই হয় তাঁরা হলেন অষ্টাদশ শতকের আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪) এবং স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-১৭৮৪)। পোপের ‘An Essay on Criticism’ জনসনের ‘Preface to the Plays of William Shakespeare’ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দুটি প্রবন্ধ।

প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্যের ধ্রুপদীয়ানার যে গাম্ভীর্য এবং ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ডের নবজাগরণের কালে তার পুর্ননবীকরণ সাহিত্য সমালোচনার যে বিশেষ দিকগুলিকে পাঠক, দর্শকের সামনে তুলে ধরছিল তা হল সংযত রীতি ও যুক্তি নির্ভরতা। অর্থাৎ একদিকে আবেগ অন্যদিকে যুক্তির এই যুগপৎ দৃষ্টির মধ্যেকার যে আপাত দ্বন্দ্বের অবস্থান তার একেবারে বিপরীত কোটিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করবেন তাঁর একান্ত নিজস্ব সমালোচনার ভঙ্গি।

১৯০৪ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ ‘প্রাচীন সাহিত্য’এর অন্তর্ভুক্ত ‘রামায়ণ’ নামে যে প্রবন্ধটি লেখেন যা আসলে দীনেশচন্দ্র সেনের ‘রামায়ণী কথা’র ভূমিকা সেখানে সমালোচনা সাহিত্য বিষয়ে তাঁর ধারণার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আমরা পেয়ে যাই। তিনি বলছেন-

"সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন তাঁহার এই রামায়ণচরিত্র-সমালোচনার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করেন, তখন আমার অস্বাস্থ্য ও অনবকাশ সত্ত্বেও তাঁহার কথা আমি অমান্য করিতে পারি নাই। কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পূজার আবেগ-মিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা; এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর-এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অথবা যেখানে পাঠকের হৃদয়েও ভক্তি আছে সেখানে পূজাকারকের ভক্তির হিল্লোল তরঙ্গ জাগাইয়া তোলে। আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাজার-দর যাচাই করা, কারণ সাহিত্য এখন হাটের জিনিস। পাছে ঠকিতে হয় বলিয়া চতুর যাচনদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সকলে উৎসুক। এরূপ যাচাই-ব্যাপারের উপযোগিতা অবশ্য আছে, কিন্তু তবু বলিব-- যথার্থ সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারি পুরোহিত, তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।"[১]

এখন একজন পাঠক বা সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা বিষয়ে এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে যান। বিশেষত তাঁর বক্তব্যের শেষ বাক্যটি সবচেয়ে বিতর্কিত। যেখানে তিনি যথার্থ সমালোচনা অর্থে একপ্রকার সাধারণীকরণ করে তার সঙ্গে 'ভক্তি' নামক বিশেষ উপাদানটিকে যুক্ত করে দিচ্ছেন। তবে এই ক্ষেত্রে সম্ভবত রামায়ণ, মহাভারতের মতো চিরকালীন সাহিত্যের বিষয়টি তাঁর চিন্তনের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই চিরকালীন প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী যে প্রায়শই পক্ষপাতদুষ্টভাবে পরিচালিত হবেন তা আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখাতে দেখাতে যাব।

উল্লেখপঞ্জি :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “প্রাচীন সাহিত্য”, ‘রামায়ণ’, রবীন্দ্ররচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা সার্ধজন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ২২ শে শ্রাবণ ১৪২৩, পৃষ্ঠা-১৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন সাহিত্য : সমালোচক রবীন্দ্রনাথের নবনির্মাণ

‘প্রাচীন’ আর ‘ঐতিহ্য’ শব্দদ্বয়ের অর্থগত নৈকট্যের কারণে অনেকসময়ে এই দুই শব্দের অভেদ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তনে এই প্রক্রিয়া আরও প্রবল। আর এই প্রাচ্যবিদ্যার ঐতিহ্যের শিকড়ের টান থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর যাপনের নানা পর্বে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির জগতে ফিরে গেছেন বারবার। নিজের সময়ের যাপনের অসংগতির সদুত্তর পেতে চেয়েছেন সেই সময়ের কোলে মাথা রেখে। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী সাহিত্যকর্মে সময়ের এই অতীত চারণ হ্যামলিনের বাঁশির মতোই তাঁকে করে তুলেছে ‘সুদূরের পিয়াসী’। কিন্তু এই অতীতচারিতার পিছনে ক্রিয়াশীল কারণটির স্বরূপ জানতে হলে আমাদের পিছনে ফিরে তাকাতে হয়। শুনে নিতে হয় তাঁর সময়ের ভাঙাগড়ার স্বরটিকে। ‘সে বড় সুখের সময় নয়।’ উনিশ শতকের বাংলাদেশে সেদিন একদিকে ক্রম ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র অন্যদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে এক বেহুঁশ সময়ের হুঙ্কার। দেশীয় জমিদারসমাজের অধিকাংশই তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে মেতে উঠেছেন। ঠিক এই সময়ে দাঁড়িয়ে এক ব্যতিক্রমী ভূমিকা নিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার : “যখন পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণের বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ, তখন রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব ও ভ্রাতৃবর্গ সমকালীন চিন্তাধারায় নানা সমস্যার সমাধান খুঁজে ফিরেছেন ভারতবর্ষের যুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারে। এই অনুসন্ধিৎসারই অন্যতম উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।”[১]

এককথায় ঠাকুর পরিবারের এই শিকড় সন্ধান রবীন্দ্রনাথের মজ্জাগত। যা তাঁর পরবর্তীকালের সাহিত্য সাধনে শুধু নয় নিজের জীবন যাপনের ব্যবহারিক প্রয়োগেও একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে আজীবন থেকে যাবে। তপোবনের আদর্শে তাঁর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার

কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এই কথাগুলোর প্রয়োজনীয়তা কি আদৌ আছে? উত্তর অবশ্যই আছে। কারণ পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত ও বাল্যকালের ধারাবাহিক কঠোর সংস্কৃত শিক্ষা যে আসলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতাকে খানিক পক্ষপাতদুষ্ট করে তুলবে না এই কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। আর এখানেই আসলে লুকিয়ে সমালোচক হিসেবে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বিশ্লেষক রূপে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের মানদণ্ডটি। এই মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন তার উত্তর খোঁজার অভিপ্রায়ে এই অধ্যায়ের অবতারণা। 'প্রাচীন সাহিত্য 'গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯০৭ সালে। চোদ্দ বছর ধরে লেখা যে প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সেগুলি হল 'মেঘদূত' (১৮৯২), 'কাদম্বরী চিত্র' (১৮৯৯), 'কাব্যের উপেক্ষিতা' (১৯০১), 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' (১৯০২), 'শকুন্তলা' (১৯০৩), 'রামায়ণ' (১৯০৪), 'ধম্মপদং' (১৯০৬)। বর্তমান অধ্যায়ে কালনুক্রমিকভাবে এই প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ আমাদের উত্তর খোঁজার প্রধান আধার।

সমালোচনা ও রসালোচনা এই দুই বিষয়ের মধ্যে একটা অলিখিত বিরোধ সদা ক্রিয়াশীল। এই পর্বে আমাদের আলোচ্য 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি সেরকমই বিরোধের একটি আদর্শ উদাহরণ। মানসীর 'মেঘদূত' কবিতাটির প্রায় ছয় বছর পর লেখা 'মেঘদূত' নামেই চৈতালি কাব্যগ্রন্থে (১৮৯৬) সংকলিত রবীন্দ্রনাথের একটি সনেটের কথা বলা দরকার : "কবিতার প্রথম লাইনটি খুবই নাটকীয় ভাবে শুরু হয়েছে- নিমেষে টুটিয়া গেল সে মহাপ্রতাপ। মহাপ্রতাপের স্বরূপটি কী? সেটি হল কবি কল্পনার একটি মিলনের সুখরাজ্য। সেখানে সমস্ত মানুষই একটি সর্বাত্মক মিলনবন্ধনের মধ্যে মহাপ্রতাপে রাজত্ব করছিল। তারপর একদিন দেবতার শাপ নেমে এল। বিচ্ছেদের শিখা এসে মিলনের কুহেলিকা দূর করে দিলে। যে ছটি ঋতু চলে গেল সেই সুখ রাজ্যের যবনিকা তুলে দিয়ে। দেখা গেল, শুধু অশ্রুপ্লুত আষাঢ়ের

সুন্দর এই ভুবনে শুধু বিরহেরই সকরুণ বীণা বেজে চলেছে অবিরাম। আগেকার মানসীর মেঘদূত কবিতাটিতেও এমন একটি সুখরাজ্যচ্যুতির অভিশাপের স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল কবিতাটির শেষের দিকে, যখন বলছিলেন :

“ভাবিতেছি অর্ধ রাত্রি অনিদ্র নয়নে

কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান।”

কাজেই মেঘদূত-পাঠের প্রতিক্রিয়ায় যে নিজস্ব পাঠ রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন তাতে মিলনের সুখরাজ্যের অবিচ্ছিন্ন একাত্মতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার চিন্তাটা প্রথম থেকেই ছিল।”[২]

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এই ‘ব্যবধান’ এর ভাবনা থেকেই তাঁর ‘প্রাচীন সাহিত্যে’র ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধে প্রবেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধটিকে কোনো একটি বিচ্ছিন্ন সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ হিসেবে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা ভুল করব। শৈশবের কালিদাস ও সংস্কৃতচর্চা- ‘মানসী’ (১৮৯০) পর্বে এসে যার পরিণত রসস্ফূর্তি, সেই সামগ্রিক বিরহ ভাবনার বাকি থেকে যাওয়া অংশটি যেন এই প্রবন্ধে এসে পূর্ণতা পেল। তাই রবীন্দ্রনাথের মেঘদূতের সাহিত্য সমালোচনা আসলে সেই ‘মানসী’ র ‘মেঘদূত’ কবিতা থেকে শুরু হয়ে গদ্যের জমি পায় আলোচ্য এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়া হোক রবীন্দ্রনাথ নিজেও বোধহয় সেরকমটা চাইতেন না। আর চাইতেন না বলেই হয়তো তিনি এই প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বেছে নিয়েছিলেন এরকম একটি কাব্যিক আঙ্গিক। গোটা জীবনটা যে মানুষের সাহিত্য সাধনা সেখানে এই ধরনের প্রবন্ধ আসলে একটা সামগ্রিক ভাবনার অংশরূপ মাত্র এবং সেই দিক থেকে অভিনবও বটে।

কিন্তু এই অভিনবত্ব বিচার একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে। তাঁর সাহিত্য যাপনের বিশেষ মনোভঙ্গিকে মাথায় রেখে। রবিবলয়ের বাইরে এসে 'মেঘদূত' প্রবন্ধকে দেখতে চাইলে বিষয়টি খানিকটা অন্যরকম বৈকি। রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য এই প্রবন্ধটির সাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ডে আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্ববর্তী আলোচকগণ খুব বেশি রবীন্দ্রবলয়ের বাইরে গিয়ে যে দেখার চেষ্টা করেছেন এরকম উদাহরণ প্রায় নেই। এই পক্ষপাতিত্ব তাই কেবল রবীন্দ্রনাথের একার দিক থেকে হয়েছে এমনটা ভাবার কারণ নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে সচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথ একজন বিশ্লেষকের ভূমিকায় অবতীর্ন হননি। একজন লেখক হিসেবে এই অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা যারা কেবলমাত্র সাহিত্য সমালোচনার দিক থেকে প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করব তখন সবসময় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে দেখতে চাইলে আমরা ঠিক নিরপেক্ষ বিচার করতে পারব না। রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনায় এই নিরপেক্ষহীনতা একটা বড়ো প্রতিবন্ধকতা।

অন্যদিকে বাণভট্টের 'কাদম্বরী'কে রবীন্দ্রনাথ বিষয়বস্তু অপেক্ষা তার আঙ্গিকগত দিক থেকে দেখতে বেশি আগ্রহী : "এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে তিনি নিজের রচনাটির মধ্যে নানা উপায়ে মূল কাদম্বরী কাব্যের অনুরূপ একটি আবহ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের 'কাদম্বরী চিত্র' সাধারণ সমালোচনার সগোত্র হইতে পারে নাই। ইহা যেন মূল মূর্তির সাদৃশ্যেই আর একখানি মূর্তি গড়িয়া দ্বিতীয়টির সাহায্যে প্রথমটিকে বুঝাইবার শিল্পী ও রসিক জনোচিত প্রয়াস। এই প্রচেষ্টার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ 'কাদম্বরী' বর্ণিত কোন ভাবের, তত্ত্বের বা প্রেম ও জীবন-সমস্যার অবতারণা করেন নাই। এক কথায় বলিতে পারা যায়, তত্ত্বভাবুকতার তুলনায়, এমন কি রসমহলের তুলনায়ও রূপমহলের আকর্ষণেই তিনি অধিক মজিয়াছেন।... এই পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের রস্বাসাদন পদ্ধতির ব্যতিক্রম।"[৩]

আঙ্গিক বিচারের এই একান্ত রাবীন্দ্রিক ব্যাখ্যার পথেই অবশ্য আমরা রবীন্দ্রনাথের বাণভট্টের 'কাদম্বরী' গ্রন্থটি সম্পর্কে একটি অভিনব উক্তি পাবো: "সংস্কৃতসাহিত্যে গদ্যে যে দুই-তিনখানি উপন্যাস আছে তাহার মধ্যে কাদম্বরী সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।"[৪] ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত-সাহিত্যের শ্রব্যকাব্যের একটি শাখা হল 'গদ্যকাব্য'। ছন্দবন্ধনহীন রচনা এক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট। অলঙ্কার শাস্ত্র অনুযায়ী এই গদ্যভাষায় লেখা কবিকর্মের দুটি ভাগ। একটি 'কথা' অন্যটি 'আখ্যায়িকা'। অমরকোষ বলছে যে রচনায় বাস্তব অভিজ্ঞতা বা ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হয়ে থাকে তা আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর রচনার ক্ষেত্রে অনেক সময় লেখক স্বয়ং নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্যদিকে 'কথা'য় কাল্পনিক কাহিনি বিবৃত হয়ে থাকে। এই রচনায় লেখকের নিজের কোনো ভূমিকা থাকে না। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাণভট্টের 'কাদম্বরী' সংস্কৃত গদ্যকাব্যের 'কথা' র অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সরাসরিভাবে 'কাদম্বরী'কে 'উপন্যাস' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই নির্দেশিকা বলা বাহুল্য 'কাদম্বরী'-র বহু বিচিত্র কাহিনি ও উপকাহিনির সমাবেশকে মাথায় রেখে। যে সাহিত্য আঙ্গিকের জন্ম বাণভট্টের কালের অনেক পরে সেখানে রবীন্দ্রনাথের 'কাদম্বরী'-কে উপন্যাস হিসেবে সমালোচনার বিষয়টি প্রশ্নযোগ্য হতে পারে। 'কাদম্বরী'-কে উপন্যাস নামক সাহিত্য আঙ্গিকের অন্তর্ভুক্ত করে আসলে রবীন্দ্রনাথ কী উপন্যাসের নতুন সংজ্ঞা দিতে চাইছেন? যেখানে বর্ণনার আধিক্যকেই তিনি উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য বলে মনে করছেন। কিন্তু প্রবন্ধটি লেখার প্রায় চার বছরের মাথায় যিনি 'চোখের বালি'র (১৯০৪) মতো উপন্যাস লিখবেন তার পক্ষে কেবল বর্ণনার আতিশয্যকে মাথায় রেখে কাহিনি-উপকাহিনির বিস্তারের কথা ভেবে 'কাদম্বরী'-কে উপন্যাস পর্যায়ভুক্ত করা অনেকটাই অরাবীন্দ্রিক সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সময়ের যে ধৈর্যের অভাবের কারণকে মাথায় রেখে প্রাচীন সাহিত্যের বর্ণনার আধিক্যের সপক্ষে যুক্তি সাজাতে চেয়েছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে

নিজের উপন্যাস ভাবনায় আখ্যানের গতির ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সেই পথেই ‘উপন্যাস’ শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি বিভ্রম বা ফ্যালাসি তিনি ঘটিয়ে ফেলেছেন। সম্ভবত তিনি ‘উপন্যাস’ শব্দটি আক্ষরিক অর্থে না-ধরে একটি বিশেষ সময়ের লেখক ও পাঠকের মানসিকতা হিসেবে ধরতে চেয়েছেন। যে মানসিকতায় গল্প নয় বর্ণনা প্রধান, প্লটের বুনট নয় তার বিস্তার প্রধান। কিন্তু এটা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ‘কাদম্বরী’ গ্রন্থটি সম্পর্কে ‘উপন্যাস’ সাহিত্য আঙ্গিকটির প্রয়োগ একটি স্ববিরোধিতার জন্ম দিয়েছে। যে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ উপন্যাসে বাহ্যঘটনার আড়ম্বর কমিয়ে চরিত্রের অন্তর্বয়নে যত্নশীল হবেন, প্লটের গতির প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দেবেন তিনি ‘কাদম্বরী’এর মত বহু ঘটনার একটি গদ্যকাব্যকে উপন্যাস অভিধায় সূচিত করবেন কোন যুক্তিতে?

আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃত সাহিত্য প্রীতির ফলে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত। আর এই কারণেই যখন তিনি রামায়ণ-মহাভারত কালিদাস বাণভট্ট প্রমুখদের রচনা, বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করছেন তখন প্রথম থেকেই তাঁর মন ছিল গ্রহণশীল ও শ্রদ্ধানিষিক্ত। আর এই শ্রদ্ধা ভক্তির পথেই তাঁর সমালোচনা বিষয়ে ‘পূজা’ শব্দটির প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে চলে আসে। এই মানসিকতার ব্যতিক্রম কে সরিয়ে রেখেও বলা যায় অন্তত প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যে সাহিত্য সমালোচনা করবেন বলে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন এমন কোনো ভাবনাই তাঁর ছিল না। নিজের ভালোলাগা এবং কিছু ক্ষেত্রে তাঁর মন্দলাগার বিষয়কে পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার তাগিদেই তাঁর প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা। যেখানে মন্দলাগার কথা তুলছেন সেখানেও আসলে অন্তরে সেই রচনাকে গ্রহণ করবার তাগিদই প্রধান। আর সেই কারণেই প্রাচীন সংস্কৃত ও বৌদ্ধসাহিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন কিছু ভেবেছেন, কিছু বলেছেন তখন সেই সংশ্লিষ্ট সাহিত্য বা গ্রন্থটির প্রতি বিশ্লেষণী প্রবণতা মুখ্য হয়ে ওঠেনি। মুগ্ধতা তার স্থান অনেকাংশে দখল করেছে। তবুও সেই

মুগ্ধতাই কোথাও কোথাও পরবর্তী সময়ের সমালোচক রবীন্দ্রনাথের হয়ে ওঠার ঝলক আমাদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তাই ভূমিকায় যে প্রশ্ন, যে চ্যালেঞ্জের প্রসঙ্গ উঠেছিল সেই মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হলেও তাঁর প্রতিভার সঙ্গে যে সমান বিচার করতে পেরেছেন এমনটা আমরা বলতে পারব না।

উল্লেখপঞ্জি :

১। সুকুমারী ভট্টাচার্য, "রবীন্দ্র সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব", 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ', তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৫, পৃষ্ঠা- ১৩১

২। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, "মেঘদূত ও নবমেঘদূত", 'রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য : নবীন অনুভব', সন্দীপকুমার মণ্ডল সম্পাদিত,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১১, পৃষ্ঠা- ১২২

৩। হরনাথ পাল, 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য', এস ব্যানার্জী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা- ১২৫

৪। তদেব

তৃতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য : সমালোচক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু সুস্পষ্ট অভিমত আছে। সেই অভিমতগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যেখানেই মানুষের অবমাননা, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সেখানেই তিনি নির্মম সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আর যেখানে তা হয়নি সেখানে তিনি মুগ্ধ পাঠকের মতো তার রসাস্বাদন করেছেন এবং তার সূত্রে সেই সাহিত্যের অভিনব পাঠোদ্ধার ও অপরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

মঙ্গলকাব্যগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে প্রশংসার কথা প্রায় নেই বললেই চলে। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্রবিশেষ বা ভারতচন্দ্রের কাব্যের শিল্পচাতুর্য তাঁকে মুগ্ধ করলেও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তিনি স্বৈরাচারী শক্তির অহেতুক জয়গান এবং মানবতার অকারণ অবমাননাকেই প্রত্যক্ষ করে পীড়িত ও বিরক্ত হয়েছেন।

যে কারণে মঙ্গলকাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনীহা ঠিক তার বিপরীত কারণেই বৈষ্ণব-কাব্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। বৈষ্ণবকাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগের কারণ একই সঙ্গে মানবিক এবং সাহিত্যিক। তিনি শুধু যে বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে পদ রচনা করেছিলেন তাই নয়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় 'পদরত্নাবলী' (১৮৮৫) সংকলনও করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যমূল্য সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, পদাবলীর ভাব, ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে তাঁর অনুরাগমণ্ডিত আলোচনা, বিভিন্ন আলোচনাসূত্রে পদাবলীর উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ পদকর্তাদের কাব্যবৈশিষ্ট্য ও কাব্যসৌন্দর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ-এ সবই জ্ঞাত তথ্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মঙ্গলকাব্যের আলোচনায় মূলত মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' ও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যদুটির উল্লেখ বারবার করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসেছে 'মনসামঙ্গলে'র প্রসঙ্গও। তবে সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে তাঁর ভাঁড়ু দত্ত প্রীতি। মঙ্গলকাব্যের একমাত্র এই চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। বস্তুত তাঁর সাহিত্যের সৌন্দর্য তত্ত্বের একটা বড়ো অংশ এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালে 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধে ভাঁড়ুদত্ত চরিত্র প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যে সমগ্রতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন তাই তিরিশ বছর পর 'সাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকায় সাহিত্যের সামগ্রীতে রূপান্তরিত হল। নিজের পূর্বেকার ভাষ্যের সামান্য বদল ঘটিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যের সীমাবদ্ধ দর্শনের তত্ত্বকে পরিণত করবেন আনন্দবাদের সামগ্রিকতায়। আর এখানেই মধ্যযুগের সাহিত্যের সমালোচক রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর এতদিনকার মুগ্ধতার দৃষ্টিকে পাশে সরিয়ে রেখে সাহিত্যকে দেখার একটা সামগ্রিক দৃষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবেন। এই যাত্রাপথে ভাঁড়ুদত্ত চরিত্রটি একটি মাইলফলক বলাই যায়।

সমালোচক রবীন্দ্রনাথের উন্মেষপর্বের এই প্রবন্ধগুলিতে বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনার একটি নতুন তত্ত্বের জন্ম দেবে-'কল্পনাতত্ত্ব'। কিন্তু এই 'কল্পনা' যে আমাদের প্রচলিত যাপনের 'কল্পনা' শব্দটির সমার্থক নয় সেই বিষয়টি যথার্থ ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন সাহিত্য সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী এটা কল্পনা কথাটার প্রচলিত অর্থ নয়। কল্পনা বলতে আমরা সাধারণত সেই শক্তিকেই বুঝি যার সাহায্যে স্মৃতির টুকরোগুলিকে খুশি মতো সাজিয়ে গুছিয়ে যে-কোনো রকমের ছবি বা কাহিনী রচনা করা যায়। অর্থাৎ এই কল্পনা ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি 'Assemble' বাংলায় বলা যাক সংগঠন সেই কাজটি সমাপন করে থাকে। এই ক্ষেত্রে স্মৃতির ভূমিকা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ। স্মৃতিগুলোকে পরপর সাজিয়ে

আমরা একটা আদলকে তৈরি করি। প্রাচীন সাহিত্যতত্ত্বে এই পুনর্গঠনের শক্তিকে বলা হয়েছে ফ্যান্টাসি। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে রোমান্টিক কবি- শিল্পীদের কাছে আমরা পুনর্গঠন বৃত্তির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আর এক রকম শক্তির কথা আমরা শুনতে পাব। তাকে বলা হয়েছে সৃজনশীল কল্পনা। এখানে এসে আমরা দেখতে পাবো স্মৃতি নামক বিষয়টির ভূমিকা এখানে প্রায় নেই বললেই চলে। সংগঠনের দিক থেকে এই কল্পনা স্বাধীন ও একক। একেই রবীন্দ্রনাথ বলবেন 'কবির কল্পনা'। শিল্প সাহিত্য সমস্তটাই এই কবি কল্পনারই ম্যানিফেস্টেশন।

তবে প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্বে কবি কল্পনার কথা থাকলেও এর তাত্ত্বিক ভিত্তি খুঁজতে গেলে আমদের পাশ্চাত্য রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বের দিকে নজর ঘোরাতেই হয়। 'The Oxford Companion to English Literature' বইটিতে Margaret Drabble রোমান্টিসিজমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন: "A literary movement, and profound shift in sensibility, which took place in Britain and throughout Europe roughly between 1770 and Intellectually it marked a violent reaction to the Enlightenment. Politically it was inspired by the revolutions in America and France...Emotionally it expressed an extreme assertion of the self and the value of individual experience...together with the sense of the infinite and the transcendental. Socially it championed progressive causes...The stylistic keynote of Romanticism is intensity, and its watchword is 'Imagination.' "[১] গোটা সংজ্ঞায় 'intensity' এবং 'Imagination' শব্দদুটির প্রতি আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। কীসের প্রগাঢ়তার কথা এখানে বলা হচ্ছে? অনুভবের। এবং এই অনুভব প্রক্রিয়াটি কীসের মাধ্যমে মূর্ত রূপ পেতে পারে? কল্পনা বা 'Imagination'

এর দ্বারা। অর্থাৎ যে কবি কল্পনার কথা রবীন্দ্রনাথ বলছেন তাঁর প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা প্রায় একশো বছর আগে ইউরোপের মাটিতে পুরোদমে চর্চিত একটি বিষয়। ইংরেজ রোমান্টিকদের মধ্যে কল্পনাতত্ত্বের প্রসঙ্গে একদিকে ব্লেকের নাম এবং অন্যদিকে কোলরিজের নাম ও তৎসহ ওয়ার্ডসওয়ার্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের আগে অবশ্য বেকন, হিউম, কান্ট প্রমুখ দার্শনিকদের দর্শন চিন্তায় বারবার এই কল্পনার প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে এসেছে।

পাশ্চাত্য রোমান্টিসিজমের এই কল্পনা মাহাত্ম্য রবীন্দ্রনাথেরও পূর্বে মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্রের উপর প্রবলভাবে পড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে এই 'impressionistic approach' রবীন্দ্রনাথের একেবারে স্বতন্ত্র আবিষ্কার। কল্পনা প্রসঙ্গে যে সামগ্রিকতার সূত্র কান্ট, কোলরিজ হয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাবনায় পূর্ণতা পাচ্ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে তার বৃত্ত সম্পূর্ণ হল রবীন্দ্রনাথের হাতে।

উল্লেখপঞ্জি :

1. Drabble, Margaret (Ed), ‘The Oxford Companion to English Literature’, 6th Edition, Oxford University Press, 2000, page- 472

চতুর্থ অধ্যায়

লোকসাহিত্য : রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে পুনরাবিষ্কার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ২০০১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলির ষোড়শ অর্থাৎ গ্রন্থপরিচয় খণ্ডের প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থটি গদ্য গ্রন্থাবলির তৃতীয় ভাগ হিসাবে মজুমদার লাইব্রেরি থেকে সুহাসচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক ১৯০৭ সালের ২৬ জুলাই প্রকাশিত হয়। 'মজুমদার লাইব্রেরি' প্রকাশনা-সংস্থা থেকে তখন রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাগুলি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছিল। গদ্যগ্রন্থাবলী নামের এই খণ্ডগুলির তৃতীয় ভাগে 'লোকসাহিত্য' নামে এই প্রবন্ধগুলি একত্রে বিন্যস্ত হয়। প্রথম প্রকাশকালে বইটির অন্তর্গত ছিল তিনটি মাত্র প্রবন্ধ। সাময়িকপত্রে সেই প্রবন্ধগুলির প্রকাশসূচি নিম্নরূপ :

১। 'ছেলেভুলানো ছড়া ': সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১- 'মেয়েলি ছড়া' নামে

২। 'কবি সঙ্গীত' : সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২- 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার' নামে

৩। গ্রাম্য সাহিত্য' : ভারতী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের পৌষে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ থেকে কিশোরীমোহন সাঁতরা 'লোকসাহিত্য' এর যে চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশ করেন, তাতে একটি নতুন প্রবন্ধ যুক্ত হয় 'ছেলেভুলানো ছড়া : ২' নামে। এই লেখাটি ছাপা হয়েছিল সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার মাঘ ১৩০১ এবং কার্তিক ১৩০২ সংখ্যাদুটিতে। 'ছেলেভুলানো ছড়া : ২' প্রবন্ধটিতে মোট ৮১ টি ছড়া স্থান পেয়েছে। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হবার সময়ে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত ৩০ টি ছড়ার মধ্যে গ্রন্থভুক্ত হয়েছিল ২৬ টি। কারণ বাকি ছড়াগুলি সামান্য পাঠান্তরে 'সাধনা'য় প্রকাশিত 'মেয়েলি ছড়া'র মধ্যেই মুদ্রিত হয়েছিল। বাকি ২৭ সংখ্যক ছড়া থেকে শুরু করে ৮১ সংখ্যক

ছড়া পর্যন্ত ‘মেয়েলি ছড়া/ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ শিরোনামে ১-৫৫ চিহ্নিত ছড়া হিসেবে যেগুলো কার্তিক ১৩০২ সংখ্যায় মুদ্রিত করা হয়েছেল, গ্রন্থভুক্ত হবার সময়ে সেই প্রত্যকটি ছড়াই স্থান পায়। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে ‘ছেলেভুলানো ছড়া’ এবং ‘ছেলেভুলানো ছড়া : ২’ দুটি প্রবন্ধই আসলে একে অন্যের পরিপূরক। প্রথমটায় একজন সমালোচকের চোখে তিনি ছড়া গুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করছেন আর দ্বিতীয়তে সেই ছড়াগুলিরই বিপুল সংকলনকে তুলে ধরছেন। এ পর্যন্ত মোট ষোলোটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থের। সর্বশেষ গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৪১৯। লোকসাহিত্য গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলির কালসীমা ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৮। মোট চার বছর। তবে এই ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধ এবং পূর্বে কথিত ‘বাউল গান’ প্রবন্ধটি বাদ দিয়েও রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু গ্রন্থের ভূমিকা, মুখবন্ধ, ভাষণ ও ইংরেজি প্রবন্ধেও বিচ্ছিন্ন লোকসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সমালোচক মননের পরিচয় রেখেছেন। সেগুলি নিম্নরূপ-

১। গ্রন্থের ভূমিকা :	‘ঠাকুরমার ঝুলি’/ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার,	২০ ভাদ্র ১৩১৪
২। গ্রন্থের মুখবন্ধ :	‘মেয়েলি ব্রত’/ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়,	৭ই পৌষ ১৩০৩
	সম্পাদনা- শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়	
৩। গ্রন্থের ভূমিকা :	‘বেড়াল ঠাকুরঝি’/ বিভূতিভূষণ গুপ্ত,	১০ শ্রাবণ ১৩৩০
৪। গ্রন্থের ভূমিকা :	‘কাঠের কাজ’/ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ,	৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩২
৫। গ্রন্থের ভূমিকা :	‘হারামনি’/ মুহম্মদ মুনসুর উদ্দীন,	১৩৩৪

৬। ভাষণ : 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'/ বঙ্গীয় সাহিত্য, পরিষদ ভাষণ — ১৭ ই চৈত্র ১৩১১

৭। ইংরাজি প্রবন্ধ : 'Creative Unity' গ্রন্থের অন্তর্গত, 'An Indian Folk Religion' প্রবন্ধ — মার্চ ১৯৩০

লোকসাহিত্য বিষয়টি আসলে সংযুক্ত হয়ে আছে এই চিরকালীনতার মধ্যে। আমরা ছড়া পড়ার সময় তার নির্দিষ্ট সময়কাল নিয়ে যতটা না ভাবিত হয় তার থেকেও বেশি দোলায়িত হয় তার সহজ সুরের ঝংকারে। গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছেন :

"বাংলার একটি সুপরিচিত ছেলে ভুলানো ছড়া এই-

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুরালো বর্গী এল দেশে,

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবে কিসে।

এখানে 'বর্গী' শব্দটির উল্লেখ দেখে একথা মনে করা স্বাভাবিক যে ছড়াটি এ দেশে বর্গীর আক্রমণের সময় অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়েছিল। কিন্তু যদি তাই হয়ে থাকে, তথাপি দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যেই হয়ে ছিল না, তা অষ্টাদশ শতাব্দী তারপর ঊনবিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে গেছে।... যে সমস্যাটির উপর নির্ভর করে এই ছড়াটি মূলত রচিত হয়েছে, তা বর্গীর আক্রমণের মত কোন সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যা নয়, বরং তার পরিবর্তে শিশুকে জননীর ঘুম পাড়ানোর মত এক চিরন্তন গার্হস্থ্য সমস্যা।" [১]

বুঝতে অসুবিধা হয়না রবীন্দ্রনাথ সমস্যার এই চিরকালীনতার দিকটি থেকেই ছড়াগুলিকে কালজয়ীর বিশেষণে ভূষিত করছেন। কিন্তু উল্লিখিত গার্হস্থ্য সমস্যার কেন্দ্রে যে শিশুর অবস্থান তাকেই সকল ছড়ার মূল ধরে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য প্রবন্ধে কিছুদূর পরই বলবেন:

“ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর-কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা-অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে।

“এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল-পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য; তাহারা মানবমনে আপনি জন্মিয়াছে।”[২]

শুধু এই প্রবন্ধটিতেই নয় ‘ছেলেভুলানো ছড়া : ২’ প্রবন্ধটিতেও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুরূপ:

“আমাদের অলংকারশাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীতকোমল দেহের যে স্নেহোদ্‌বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প চন্দন গোলাপ-জল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার

মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে--সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন।”[৩]

বলা যেতে পারে প্রথম প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ লোকছড়ার ক্ষেত্রে যেখানে ‘শিশু’কে করছেন স্থায়িভাব সেখানে তারই কার্যকারণ সূত্রে নির্গত দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে সেই স্থায়িভাব জাত রসের নাম করছেন ‘বাল্যরস’। বলাবাহুল্য এই নতুন রসের প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ যুক্তি অপেক্ষা আবেগকেই, তাঁর মুগ্ধতাকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। আর এটা করতে গিয়ে তিনি পুনরায় সমালোচকের বস্তুনিষ্ঠতা থেকে সরে গেছেন অনেকটা দূরে। সামগ্রিকভাবে সকল ছড়াকে শিশুসাহিত্য নামক একটি বিতর্কিত সাহিত্য আঙ্গিকের অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাটা এক্ষেত্রে স্বাভাবিক।

আসলে লোকসাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির এই আপাত সরলীকরন যতটা তাঁর বস্তুনিষ্ঠতার অভাব ততটা তাঁর সংগ্রাহক সত্তার নয়। এই পর্যায়ে তাই তিনি যতটা না সমালোচক তাঁর থেকেও জাতীয় জীবনের সন্ধিলগ্নে একজন সিরিয়াস সংগ্রাহক। সেই সংগ্রাহক সত্তার বাই প্রোডাক্ট রূপেই অন্তত এই পর্যায়ে এই সমালোচনার সৃষ্টির জন্ম হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "লোকসাহিত্য", 'ছেলেভুলানো ছড়া', রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা মার্চ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১৫৩

২। তদেব

৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সাহিত্য', এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা লি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৮০, পৃষ্ঠা-

পঞ্চম অধ্যায়

সমকালীন প্রাচ্য সাহিত্যে ও সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

(ক. কবিতা, খ. কথাসাহিত্য, গ. প্রবন্ধ, ঘ. অন্যান্য)

এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে আমরা তিনটি দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণে প্রয়াসী হব। ক।‘কবিতা’, খ।‘কথাসাহিত্য’, গ।‘প্রবন্ধ’। বাংলা গদ্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ সমালোচনার পথ ধরেই। সেই সমালোচনার বিষয় হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তিনটে পৃথক কাব্যগ্রন্থকে। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘ভুবনমোহিনী প্রতিভা’ (১৮৭৫-৭৭), রাজকৃষ্ণ রায়ের ‘অবসর সরোজিনী’ (১৮৭৬) এবং হরিশচন্দ্র নিয়োগীর ‘দুঃখসঙ্গিনী’ (১৮৭৪)। এই তিনটে কাব্যগ্রন্থকে নিয়ে, ‘ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী’ (জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, ১২৮৩ কার্তিক) নামে সমালোচনা লিখে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক জীবনের শুরু। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সাড়ে পনেরো। সেখান থেকে শুরু করে মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ সমালোচনা (প্রথম পর্যায়- ১২৮৪, দ্বিতীয় পর্যায়-১২৮৯) বিহারীলালের কবি-প্রতিভা হয়ে একেবারে আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা বিষয়ক তাঁর বক্তব্য ও সমালোচনা ‘কবিতা’ অংশে আলোচ্য।

আধুনিকতা যে অর্থে হতাশাবাদ, ক্লান্তি ও অবক্ষয়ের চেতনাকে বহন করে আনে, রবীন্দ্রনাথ তাকে কোনো স্থায়ী মূল্য দিতে অসম্মত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার বলেছেন যে, যুদ্ধোত্তরকালের আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য তাঁর নিজের পক্ষে খুব রুচিকর মনে হয়। তার মধ্যে তিনি খুঁজে পাননি প্রাণের আনন্দ সংবাদ, হৃদয়ের উত্তাপ। পাশ্চাত্য কবিতার প্রথাবিরোধী আধুনিকতার আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ যেমন সমর্থন জানাতে পারেননি

তেমনই একদল তরুণ কবি যখন বাংলা কাব্যে এই আধুনিকতাকে প্রবর্তন করতে চাইল, তখন তাঁদের কবিতার প্রতিক্রিয়া ধর্মকেও কবি সুনজরে দেখেননি। তখনকার দিনের পক্ষে তরুণতম কবিগোষ্ঠীর বিদ্রোহ এবং তাঁদের কবিতায় যুগজিজ্ঞাসার প্রতিফলন নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের স্থৈর্যকে বিচলিত করেছিল। তবু রবীন্দ্রনাথ এঁদের বিষয়ে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। বরং এই স্বতন্ত্র মেজাজকে যুগচরিত্রকে বারবার অন্তরের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে দেখেছিল। নতুন যুগের কবিদের বারবার তিনি স্বাগত জানিয়েছেন।

আধুনিকের সঙ্গে চিরন্তনের কোনো বিরোধ তিনি অনুভব করেননি। রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কবিতায় যে সৌন্দর্যময় জগতকে খুঁজে পেয়েছিলেন, সে জগতে সাময়িকতা চিরন্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সে এই রোম্যান্টিক কবিবৃন্দই ছিলেন সেকালের পক্ষে সবচেয়ে ‘আধুনিক’। তাঁর কাছে আধুনিকতার অর্থ নয় শুধু সমকালীন জীবনভাবনার বিশ্বস্ত রূপায়ণ। আসলে ‘আধুনিক’ তাঁর কাছে শাশ্বতেরই নামান্তর, এবং সেখানে সর্বদাই জেগে আছে একটি রসতন্ময় ব্যক্তিপ্রাণ –আতিশয্যহীন এবং আন্তরিক।

ইংরেজিতে যাকে ‘নভেল’ বলি, অভিধানে তার বাংলা প্রতিশব্দ ‘উপন্যাস’ হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র ভাবনায় তারা সমর্থক নয়। ‘নভেল’ বলতে তিনি কিছু প্রথাসিদ্ধ আয়োজন বোঝেন, সেই আয়োজনগুলি অনেক সময়েই প্রাগুক্ত ‘অসাধারণ মানবপ্রকৃতি’ বা ‘জটিল ঘটনাবলী’ এবং ‘প্রচণ্ড হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষ’- র বর্ণনায় সীমাবদ্ধ। একে কখনো তিনি ‘রীতিমতো উপন্যাস’-ও বলবেন। যোগেন্দ্রনাথ সাধু দ্বারা প্রকাশিত ‘দেওয়ান গোবিন্দরাম বা উপন্যাসের সমালোচনা (সাধনা, ১৩০১ ফাল্গুন) করতে বসে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন:

“গ্রন্থখানি একটি রীতিমত উপন্যাস। লেখক আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে ভীষণ অন্ধকার রাত্রি, ঘন অরণ্য, দস্যু পাতালপুরী, ছদ্মবেশিনী সাধ্বী স্ত্রী, কপটচারী পাষণ্ড এবং

সর্ববিপৎলঙ্ঘনকারী ভাগ্যবান সাহসী সাধু পুরুষ প্রভৃতি পাঠক ভুলাইবার বিচিত্র উপকরণ আছে।”[১]

‘নভেল’-এর একদিকে যদি ওই আয়োজনের আড়ম্বর থাকে তো, অন্যদিকে আছে নীতিপ্রচারকের অনিবার্য ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন:

“গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য সাধু। ইহাতে অনেক সদুপদেশ আছে এবং গ্রন্থের পরিণামে পাপের পতন ও পুণ্যের জয় প্রদর্শিত হইয়াছে।...কেহই সত্যকার সজীব মানুষের মতো হয় নাই, তাহারা যে সকল কথা কয় তাঁহার মধ্যে সর্বদাই লেখকের প্রম্পটিং শুনা যায় এবং ঘটনাগুলির মধ্যে যদিও সত্বরতা আছে, কিন্তু অবশ্যম্ভাব্যতা নেই।”[২]

উপন্যাসের হিতবাদী ভূমিকা বা নীতিবাদী ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি লক্ষণীয়। দুটি দিক থেকে তিনি বিচার করছেন বিষয়টিকে। প্রথমত, চরিত্রায়ণের অভাব এবং দ্বিতীয়ত, উপন্যাসে কথকের ভূমিকা। দুটি বিষয় একদিক থেকে অঙ্গাঙ্গিযুক্ত। কারণ, কথকের এই ভূমিকা চরিত্রায়ণের পক্ষেই তো বাধা। চরিত্রের অযুত সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দিতে পারে চরিত্রের কণ্ঠস্বরে কথকের ওই অনুপ্রবেশ। স্বাধীন চরিত্রায়ণ সবসময়েই বাধাগ্রস্ত হয় লেখকের উদ্দেশ্যমূলকতার কারণে।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের আলোচনা করতে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক , যেহেতু ওইসব সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর মেজাজের আন্তরিক অমিল। তা সত্ত্বেও তিনি রাজশেখর বসুর ‘গড্ডালিকা’ (প্রবাসী, ১৩৩২ অগ্রহায়ণ), জগদীশ গুপ্তের ‘লঘুগুরু’ (পরিচয়, ১৩৩৮ কার্তিক) এবং অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের ‘মাটির স্বর্গ’ (প্রবাসী, ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ) এই তিনটি উপন্যাসের সমালোচনা করছেন।

‘লঘুগুরু’ উপন্যাস সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল যে ঔপন্যাসিকের লেখবার ক্ষমতা আছে কিন্তু: “গল্পের চেহারাটি নিঃসন্ধিগ্ধ সত্যের মতো দেখাচ্ছেনা।”[৩] রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিলো জগদীশ গুপ্তের অভিজ্ঞতায় কোথাও না কোথাও ফাঁক রয়ে গেছে। আর সেই শূন্য ভরাবার জন্য লেখক রিয়ালিজমের দোহাই দিয়েছেন। অন্যদিকে রবীন্দনাথকৃত মুখোপাধ্যায়ের ‘মাটির স্বর্গ’ উপন্যাসের সমালোচনার ধাঁচ জগদীশ গুপ্তের ‘লঘুগুরু’- র আলোচনার মতোই। এখানেও রবীন্দ্রনাথ লেখকের সঙ্গে তাঁর মতের আন্তরিক অমিলের কথা কোনোভাবে গোপন করেননি। রবীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট ভাবে বলেছেন ‘মাটির স্বর্গ’- এর প্রধান ত্রুটি আধুনিকতার বদহজম। দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্র রচনায় রিয়ালিজমের নকল অহঙ্কার সেখানে বারবার ঘোষিত।

শুধুমাত্র রস সাহিত্য নয়, বেশকিছু সমকালীন চিন্তাশীল প্রবন্ধ গ্রন্থ্ও সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনার বিষয় হয়েছিল। ‘আধুনিক সাহিত্য’ গ্রন্থের ‘কৃষ্ণ চরিত্র’ প্রবন্ধটি সমালোচনা হলেও একে সাহিত্য সমালোচনা বলা যায় না। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণ চরিত্র’র অসামান্যতা, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার অসাধারণত্ব- সব মিলিয়ে এই প্রবন্ধটি এমন এক উচ্চতার স্তরে নিজেকে উন্নীত করেছে যে, সাহিত্য সমালোচনা না হলেও, একে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থটি খাঁটি সাহিত্য, না ঐতিহাসিক গবেষণা, না মহাভারতের সম্পাদক-সুলভ পাঠভিত্তিক অনুসন্ধানও বিচার–এর কোনটা তা নির্ণয় করা কঠিন। সবেরই ধর্ম এর মধ্যে কিছু কিছু পাওয়া যাবে। আর সেই কারণেই এই মহাগ্রন্থের যথাযোগ্য সমালোচনা সাধারণ সাহিত্য সমালোচকের পক্ষে বা সাধারণ ঐতিহাসিকের পক্ষে বা সাধারণ

দার্শনিকের পক্ষে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের ‘কৃষ্ণচরিত্র’ প্রবন্ধ প্রমাণ করে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই গ্রন্থের যোগ্য সমালোচকের যে গুণ-সমাহার আবশ্যক, তার সবই রবীন্দ্রনাথের আছে।

উল্লেখপঞ্জি :

১. রবীন্দ্র রচনাবলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পঞ্চদশ খণ্ড : খ বিবিধ, কলকাতা, মে ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭২৪

২. তদেব

৩. রবীন্দ্র রচনাবলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পঞ্চদশ খণ্ড : ক বিবিধ, কলকাতা, ফেব্রিয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা- ৮৫৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

একজন সমালোচকের প্রাথমিক পরিচয় যদি সাহিত্যকার হয় সেক্ষেত্রে তার সাহিত্যসত্তা বেশ কিছু সময় যে তার সমালোচক সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে তা আশা করা খুব একটা অমূলক নয়। সমালোচক রবীন্দ্রনাথের এক্ষেত্রে এই প্রবণতাটি একই সঙ্গে যুগপৎ স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক। স্বাভাবিক এই কারণে যে তিনি কখনই সাহিত্য সমালোচনাকে তাঁর সাহিত্য প্রবণতার একদম উঁচুতে স্থান দেননি। আর অস্বাভাবিক এই কারণে যে সমালোচনার মতো এই ভয়ানক নৈর্ব্যক্তিক কাজ করতে গিয়ে কখনও কখনও তিনি অরাবীন্দ্রিক সুলভ বস্তুনিষ্ঠতারও পরিচয় দিয়েছেন। আর এখানেই সমালোচক রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বের পরিসরটি রচিত হয়ে যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিস্তৃত ভূমিতে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের এই দ্বৈত সত্তার প্রকাশই আমরা দেখতে পাব।

পাশ্চাত্য উপন্যাসকে যদি নারী চরিত্রের বীক্ষণাগার বলা হয় তাহলে সেই ল্যাবরেটরিতে নিরন্তর গবেষণা চালিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ আর এই গবেষণা করতে করতেই তিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁর সমালোচক সত্তার একটি বিশেষ দিকের পাশাপাশি তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার কিছু নতুন দিক। সেই দিকের মূল অংশই গ্রহণ করে আছে রবীন্দ্র মননে নারী চরিত্রের অনুবর্তন। প্রাচ্য দর্শনে বিবাহ নামক একটি আপাত এহোবাহ্য তবকের আড়ালে নারী আর পুরুষের ব্যক্তিসত্তার স্ফুরণের যে জায়গার অভাববোধ তৈরি হয়েছিল পাশ্চাত্যের উপন্যাসে সেই অভাববোধের জায়গা থেকেই যাত্রাপথের শুরু। রবীন্দ্রনাথ এই যাত্রাপথের পথিক হিসেবে নিজেকে সামিল করে নিতে দেরি করেননি এতটুকু। এই প্রসঙ্গে হিন্দু-বিবাহ প্রবন্ধের খানিকটা অংশ তুলে ধরা যেতে পারে: "অনেকে হিন্দুবিবাহের পবিত্র একীকরণপ্রসঙ্গে ইংরেজি ডিভোর্স

প্রথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। ডিভোর্স প্রথার ভালোমন্দ বিচার করিতে চাহি না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে ডিভোর্স প্রথা নাই বলিয়া যে আমাদের বিবাহের একীকরণতা বিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। যে দেশে শাস্ত্র ও রাজনিয়মে একাধিক বিবাহ হইতেই পারে না সেখানে ডিভোর্স প্রথা দূষণীয় বলা যায় না। স্ত্রী অসতী হইলে আমরা ইচ্ছামত তাহাকে ত্যাগ করিয়া যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারি। স্বামী ব্যভিচারপরায়ণ হইলেও স্বামীকে ত্যাগ করা স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ।”[১] বেশ বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের এই পর্বে নারী ভাবনার যে বিবর্তন তা তা তাঁর উপন্যাস রচনায় যেমন গভীর প্রভাব বিস্তার করবে তেমনই তাঁর পাশ্চাত্য উপন্যাস সমালোচনার দিকটিকেও প্রশস্ত করবে। এরই সঙ্গে এসে যুক্ত হবে জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথের ‘বিশ্বমানব’-এর কনসেপ্ট। এই দুই মানদণ্ডকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের বেশ কিছু উপন্যাসের বিচ্ছিন্ন সমালোচনায় রত হবেন। এই সময় তিনি হাঙ্গেরীয়ান লেখক মৌরিয়স য়োকাই ও পোলিশ লেখক জোসেফ ইগনেসিয়াস ক্রাসজিউসকি- এর যথাক্রমে ‘Eyes like the see’ (১৮৯০), এবং ‘The jew’ উপন্যাসদুটির ‘সাধনায়’ সমালোচনা করেন ‘সাহিত্যের গৌরব’ (শ্রাবণ, ১৩০১) নামে। উক্ত প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ Yokai-এর ‘Eyes like the see’ (১৮৯০) উপন্যাসের সামান্য গল্পাভাস দিয়েছেন এবং বেসি নাম্নী এক নারী চরিত্রের কথাই বেশি করে বলেছেন যিনি উপন্যাসের মূল চরিত্র। মেয়েটিকে উপন্যাসে যেভাবে আঁকা হয়েছে তাতে করে তাঁর চরিত্রের যুগপৎ দুঃসাহসিকতা এবং বিকারগ্রস্ততা উভয়ই ফুটে ওঠে। পাঁচবার সে বিয়ে করেছে। শেষ স্বামীটিকে সে হত্যাও করেছে। আসলে তাঁর এই পাঁচ স্বামী: “হাঙ্গেরীর জাতীয় জীবনের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি। চাষি পরিবারের মানুষ থেকে অভিজাত শ্রেণির মানুষ পর্যন্ত সবরকম মানুষের সঙ্গেই বেসির দাম্পত্য জীবন এক-এক করে কেটেছে।” সেখান থেকে সমস্ত উপন্যাসটির মধ্যে বেসিই একাধারে নায়ক ও নায়িকা। নারীর দৃপ্ত পৌরুষের এই সম্ভাবনাময়

দিকটি সমালোচক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি তাই এড়িয়ে যায়নি। অন্যদিকে 'The jew' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে লেখক পোল্যান্ডের জাতীয় জীবনের কথাই লিখেছেন। 'সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধটি লেখার মাস চারেক আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। বাঙালি জাতীয় জীবনের প্রতিভূ এই মনস্বীর অভাববোধ নিরসনের ক্ষেত্রটি যেন রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য ঔপন্যাসিকের মধ্যে খুঁজে পেলেন। "সেইজন্যই য়োকাই-এর আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছে- 'হাঙ্গেরীয় উপন্যাসখানি খুলিয়া দেখো, মানুষ কত রকমের, কত ভালো, কত মন্দ, কত মিশ্রিত এবং সবসুদ্ধ কেমন সম্ভব, কেমন সত্য। উহাদের মধ্যে কোনটিই নৈতিক গুণ নহে, সবগুলিই রক্তমাংসের প্রাণী।' 'দ্য জ্যু' উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন- 'তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন, লেখকের প্রতিভা জাতীয় হৃদয়ের আন্দোলন-দোলায় কেমন করিয়া লালিত হইয়াছে।'"[২]

অন্যদিকে রোমান্টিক কবিদের মধ্যে শেলিই একমাত্র কবি যাঁর স্বভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাব সবচেয়ে বেশি মেলে- "শেলির মন যেমন বস্তুজগতে সম্পূর্ণ তৃপ্ত থাকতে পারেনি, সহজেই যেমন একটা অসীম নির্বস্তুক ভাবের জগতে গতিশীল বিচরণে তৃপ্তি পেত...সেই অতৃপ্ত বস্তুজগৎ থেকে সরে এসে তৃপ্তি পাওয়ার ভঙ্গিটি, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার ভঙ্গিটি রবীন্দ্রনাথের কবি-ধাতুরও মূল কথা।"[৩] আর এই জায়গা থেকেই শেলির কবিতার সমালোচনা কবিতা ধরে সেইভাবে না করলেও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ও কবিতা বিষয়ক ভাবনার অনেক বক্তব্যেই আমরা শেলির চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। কীটসের ক্ষেত্রে এই প্রবণতাটি কবির নিজের ভাষায় আরও তীব্র। তাঁর মতে অধিকাংশ আধুনিক কবিদের মধ্যে যে 'পাথর-খোদা ভাব আছে' সেই জায়গা থেকে কীটস সম্পূর্ণভাবেই মুক্ত। টেনিসনের কাব্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও কলানৈপুণ্যও রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে তিনি টেনিসনের মধ্যে সর্বজনীন মানব সত্যের বোধটিকে যথার্থই লক্ষ করতে পেরেছিলেন।

উল্লেখপঞ্জি :

১. রবীন্দ্ররচনাবলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ত্রয়োদশ খণ্ড, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৪৩৪

২. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, “উপন্যাসে জাতীয় চেতনা : দুটি বিদেশি উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথ”, ‘রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন’, একুশ শতক, কলকাতা, এপ্রিল ২০১২, পৃষ্ঠা- ১৬০

৩. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, “শেলি ও রবীন্দ্রকাব্য”, ‘রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন’, একুশ শতক, কলকাতা, এপ্রিল ২০১২, পৃষ্ঠা- ৭৬

সপ্তম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথকৃত সমালোচনায় পূর্ববর্তী ও সমকালীন চিন্তাবিদদের প্রভাব

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক চিন্তাবিদদের সাহিত্য-সমালোচনাকেন্দ্রিক ভাবনা রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তাকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। লিও টলস্টয়, বেনেদেত্ত ক্রোচে প্রমুখের সাহিত্য-সমালোচনা চিন্তার কোনো কোনো অনুষঙ্গ এই প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। টলস্টয় তাঁর 'What is Art' (১৮৯৮) গ্রন্থটিতে শিল্প বা আর্ট প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য বিধৃত করেছেন। তাঁর মতে শিল্পের মূল উদ্দেশ্য হল পূর্ণতার সঞ্চার। তাঁর এই বক্তব্য কোথাও গিয়ে রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ সম্পর্কে বক্তব্যকে স্মরণ করায়: "পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে।"[১] অন্যদিকে বেনেদেত্তো ক্রোচে ছিলেন তৎকালীন ইতালির প্রথম সারির দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং সমালোচক। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইতালি সফরে ক্রোচের সঙ্গে দেখা করে তাঁর গুণমুগ্ধতার কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। আর্ট ছিল ক্রোচের মতে একপ্রকার Intuition বা ধ্যান। এর সঙ্গে নীতি-নৈতিকতার সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ প্রায় অনুরূপ ভাষায় 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে পরবর্তীকালে বলবেন: "সাহিত্যসৃষ্টি, শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোকে যেখানে দায় নেই, ভার নেই, যেখানে উপকরণ মায়া তার ধ্যানরূপটাই সত্য।"[২] আমাদের এই প্রভাবের আলোচনায় আলোচিত হয়েছে গ্যেটের প্রসঙ্গ। "সৌন্দর্যের সারাৎসারকে প্রতিরূপ দেবার ক্ষেত্রেও গ্যেটে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রেরণাস্থল।"[৩] এছাড়া লেসিং এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য- ভাবনা প্রসঙ্গসূত্রে আলোচিত হয়েছে। ফলত এই অধ্যায়ে তুল্যমূল্য বিচারের মাধ্যমে এটা বোঝার চেষ্টা থাকবে এই সকল চিন্তাবিদদের নন্দনতাত্ত্বিক-ভাবনা থেকে রবীন্দ্রনাথ কতটা গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নিজের সাহিত্য-সমালোচক সত্তার বলয় নির্মাণ করেছিলেন।

সেই সঙ্গে সমকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্যকার, চিন্তাবিদদের প্রভাবের স্বীকরণ এবং তা থেকে মুক্তির প্রক্রিয়াটিও এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। পাশ্চাত্য রোমান্টিসিজমের এই কল্পনা মাহাত্ম্য রবীন্দ্রনাথেরও পূর্বে মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্রের উপর প্রবলভাবে পড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে এই 'impressionistic approach' রবীন্দ্রনাথের একেবারে স্বতন্ত্র আবিষ্কার। কল্পনা প্রসঙ্গে যে সামগ্রিকতার সূত্র কান্ট, কোলরিজ হয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাবনায় পূর্ণতা পাচ্ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে তার বৃত্ত সম্পূর্ণ হল রবীন্দ্রনাথের হাতে:" কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ-- কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র, কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসংগতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহারা সাহিত্যে প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে-- কারণ, ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু। এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ ভূরিপরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া পড়েন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলায় সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে।"[৪] রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ ১৮১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত 'Biographia Literariya' বইয়ের তেরোতম অধ্যায়ে 'imagination' এবং 'fancy'-এর বিভাজন রেখার কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়: "The IMAGINATION then, I consider either as primary, or secondary. The primary IMAGINATION I hold to be the living Power and prime Agent of all human Perception, and as a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I AM. The secondary Imagination I consider as an echo of the former, co-existing with the conscious will, yet still as identical with the

primary in the kind of its agency, and differing only in degree, and in the mode of operation. It dissolves, diffuses, dissipates, in order to recreate; or where this process is rendered impossible, yet still at all events it struggles to idealise and unify. It is essentially vital, even as all objects

"FANCY, on the contrary, has no other counters to play with, but fixities and definites. The Fancy is indeed no other than a mode of Memory emancipated from the order of time and space; while it is blended with, and modified by that empirical phenomenon of the will, which we express by the word CHOICE. But equally with the ordinary memory the Fancy must receive all its materials ready made from the law of association."[৫]

তবে পাশ্চাত্য কল্পনা তত্ত্বের এই খোলসটুকু গ্রহণ করেই রবীন্দ্রনাথ যেখানে নিজের মনন যোগ করেছেন সেখানেই তিনি একান্ত ভাবে রাবীন্দ্রিক হতে পেরেছেন। যেখানে পাশ্চাত্য কল্পনার প্রায়োগিক দিক কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্লেক হয়ে কীটসের সৌন্দর্য সর্বস্বতায় মিশে যায় সেখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি খোঁজে সামগ্রিক সত্যকে। এই জায়গা থেকেই তাই রবীন্দ্রনাথ কীটসের 'Beauty is truth, truth beauty'কে পালটে নেন: 'Truth Beauty' তে। রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্যমাত্রেই সুন্দর, অর্থাৎ অসুন্দর কিছুই নেই। এই সমগ্রতার জায়গা থেকেই তাই তিনি ভাঁড়ু দত্তের মতো চরিত্রকেও বিশ্লেষণ করতে পারেন।

উল্লেখপঞ্জি

১. রবীন্দ্ররচনাবলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দশম খণ্ড, কলকাতা, মার্চ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ১১২

২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৬০

৩. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, “রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটে”, ‘রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন’, একুশ শতক, কলকাতা, এপ্রিল ২০১২, পৃষ্ঠা- ৬৯

৪। রবীন্দ্ররচনাবলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দশম খণ্ড, কলকাতা, মার্চ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-২১৯

৫। Roberts Adam (Ed.), ‘Biographia Literaria’, Edinburgh University Press, 2014

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার জগৎটি ব্যাপক। এই আলোচনার পরিধি তার সবটুকুকে যে ছুঁতে পারবে এমন নয়। তবু এর মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার ধরন ও নানা বৈচিত্র্যের একটি বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন করার চেষ্টা আমাদের থাকবে। ব্যক্তিসত্তার বিশেষ মূল্য সাহিত্যে স্বীকার করেই রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন সদাজাগ্রত বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতাকে। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর আনন্দবাদী বিশ্বাসের স্থির কেন্দ্রভূমি। মূলত রসবাদী সাহিত্যচিন্তকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারে কোনো পারিভাষিক মতবাদের প্রতি আকর্ষণ তিনি দেখাননি। সমাজবাস্তবতাকে মর্যাদা দিয়ে, মনস্তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্য বিচারে তিনি নিয়োজিত থেকেছেন। সমালোচনার সেই বিশেষ ঘরানার নানা দিক সম্পর্কে আলোকপাত করাই এই গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য।

পরিশিষ্ট-ক

এই অংশে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে সমস্ত গ্রন্থ্ বা বিষয়ের সমালোচনা করেছেন তার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেবার চেষ্টা করা হবে।

গ। গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্র রচনাবলি, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১ম থেকে পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮

২. রবীন্দ্র রচনাবলি, ১ম থেকে ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

সহায়ক বাংলা গ্রন্থপঞ্জি

১. অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রনাথ : কাব্যগ্রন্থপাঠের ভূমিকা', বিশ্বভারতী প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৭৪

২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা সমালোচনার ইতিহাস', ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৭২

৩. অরবিন্দ পোদ্দার : 'রবীন্দ্রমানস ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ' : পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৭

৪. অলোক ভট্টাচার্য, 'আধুনিক দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ', ফার্মা কে. এল. এম, কলকাতা, ১৯৮০

৫. অশ্রুকুমার সিকদার, 'বাক্যের সৃষ্টি: রবীন্দ্রনাথ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১

৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০

৭. আদিত্য ওহদেদার , 'সমালোচক রবীন্দ্রনাথ' , এভারেস্ট বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৬৮

৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য', এ মুখার্জী, কলকাতা, ১৯৭৩

৯. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার , 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন' , একুশ শতক, কলকাতা, এপ্রিল ২০১২

১০. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক, 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৮৩

১১. তপোব্রত ঘোষ, 'রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের শিল্পরূপ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে ২০১২

১২. নরেশচন্দ্র জানা , 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ' , সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৮

১৩. পিনাকেশ সরকার, 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', প্যাপিরাস, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৫

১৪. প্রসূন মুখোপাধ্যায়, 'লোকসাহিত্য জিজ্ঞাসা ও রবীন্দ্রনাথ', আই. এ. পি. কলকাতা, ১৯৭১

১৫. বাসুদেব মাইতি, 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য', ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৮৭

১৬. বীণা মজুমদার, 'চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ', নাভানা, কলকাতা, ১৯৬৫

১৭. মানস মজুমদার, 'রাম রামায়ণ রবীন্দ্রনাথ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৫

১৮. মানস মজুমদার, 'লোকসাহিত্য-পাঠ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯

১৯. লায়েক আলি খান, 'রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমীক্ষা', সৃজন প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫ অগস্ট ২০১৫

২০. শঙ্খ ঘোষ, "নির্মাণ আর সৃষ্টি", শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ, ষষ্ঠ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০০২

২১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারকগ্রন্থ সাহিত্য সমালোচনা', জিজ্ঞাসা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৪

২২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল, 'সমালোচনা সাহিত্য', এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭৯

২৩. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত : দর্শন চিন্তা: রবীন্দ্ররচনা সংকলন, গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৯১

২৪. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত : সাহিত্য চিন্তা : রবীন্দ্ররচনা সংকলন', গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৯৬

২৫. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, 'সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন ২০০৩

২৬. সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত) : 'রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য' : লোকসংস্কৃতি গবেষণা, কলকাতা, ২০০৩

২৭. সুদীপ বসু, 'বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, বইমেলা ২০১০

২৮. সন্দীপকুমার মণ্ডল সম্পাদিত, 'রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য : নবীন অনুভব', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১১

২৯. সুমিতা চক্রবর্তী, 'আমার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণে বর্জনে', রত্নাবলী, কলকাতা, মার্চ ২০১০

৩০. হরনাথ পাল, 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য', এস ব্যানার্জী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি

2. Abrams, Meyer Howard, 'A Glossary of Literray Terms', 7th Edition, Thomson Asia, Singapore, 2003
3. Abrams, Meyer Howard, English Romantic Poets: Modern Essays in Criticism, Oxford University Press, London, 1969
4. Cuddon, John Anthony Bowden, 'A Dictionary of Literary Terms', Maya Blackwell, Delhi, 1998
5. Harvey, Paul , 'The Oxford Companion to English Literature', 3rd Edition, Clarendon Press, Oxford, 1965